মায়ানমারের জাতিগত সংঘর্ষ ও উত্তরপূর্ব ভারতের উপর তার প্রভাব

রূপকজ্যোতি বোরা

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মায়ানমারে সুদীর্ঘকাল ধরে যে গৃহযুদ্ধ চলছে, ভারতের উপর তার প্রভাব ঠিক কি? ২০২১ সালে যখন মায়ানমারের সামরিক বাহিনী, নির্বাচিত সরকারকে গদিচ্যুত করে জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করে, মায়ানমারে আজও ঘটে চলা সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী হিংসার কাহিনীর শুরু তখনই। সামরিক বাহিনীর এই হিংস্র পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, এই দেশের তিনটি মুখ্য জাতিগোষ্ঠী – আরাকান আর্মি (এএ), মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) ও তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) – একত্রে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স (টিবিএ) গঠন করে। এই অ্যালায়েন্স তারপর জোর করে ক্ষমতায় আসা সামরিক বাহিনীকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে। আজ, অনেক ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে এবং আরাকান আর্মি অবশেষে মায়ানমার-বাংলাদেশের সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ দখল করেছে।

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার প্রায় পরপরই মায়ানমারে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যে জাতিগত অভ্যুত্থানের ঘটনা শুরু হয়েছিল, সেই প্রারম্ভিক হিংসাই বর্তমান সংঘর্ষের রূপরেখা দান করেছে। কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি (কেআইএ), শান স্টেট আর্মি (এসএসএ), এবং এএ-র মত অনেক গোষ্ঠীই বহু বছর ধরে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত শাসকদলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই চালিয়ে আসছে। তবে, মায়ানমারের নাগরিক ও সামরিক বাহিনী থেকে পলাতক সৈন্যদের সম্মিলিতভাবে যে পিপল'স ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ) গঠনের পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে তা একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে কাজ করেছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে এই সুদৃঢ় প্রতিরোধের ঘটনা, মায়ানমারের জাতিগত যোদ্ধাদের দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্র-বিরোধিতার ঘটনাকে অতিক্রম করে যায়। আগে উল্লিখিত টিবিএ সহ, যে দলগুলি ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে সেগুলির সঙ্গে পিডিএফ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এর উত্তরে ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনী তার নিজের দেশের নাগরিকদের উপর বিমান আক্রমণ পরিচালনা করে, যার ফলে আরও হিংসার ঘটনা ঘটে এবং শাসক ও প্রতিরোধীদের মধ্যে অবিরাম ঘটে চলা এই টানাপোড়েনের কারণেই মায়ানমারের সাধারণ জনগণ হিংসার একটি ভয়াবহ বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে চলেন।

এই সামরিক অভ্যুত্থানের ঠিক আগেই, ভারতের সঙ্গে মায়ানমারের গণতান্ত্রিক শাসকদলের একটি অত্যন্ত সফল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সামরিক শাসকদলের নেতা মিন অং হ্লাইং-এর উত্থান এবং টিবিএ-এর আক্রমণের মুখেই দেশের সম্পূর্ণ এলাকার উপর ক্ষমতা একীভূত করার জন্য মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর প্রবল প্রচেষ্টার কারণে ভারত তার পূর্ব সীমান্তে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রবেশপথ, বিনিয়োগ, জনজাতিগত সম্পর্ক

এই দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় ভারতের অনেক কিছুই হারানর আছে। প্রথমত, সামগ্রিকভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রবেশদ্বার মায়ানমার, কারণ মায়ানমার অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস (এএসইএএন)-এর একমাত্র সদস্য যার সঙ্গে ভারত ভূ-সীমান্ত ভাগ করে নেয়। ঘটমান গৃহযুদ্ধের কথা বিবেচনা করে, নতুন দিল্লি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ভারত তার সীমান্তের এই অংশটি বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু এই অঞ্চলে পর্বত ও বৃষ্টিপাতের আধিক্যের কারণে, এই কাজটি কঠিন। ভারত ইতিমধ্যেই ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম (এফএমআর) বাতিল করে দিয়েছে। এমএমআর অনুযায়ী, আগে নিয়ম ছিল যে, এই অঞ্চলের গভীর জাতিগত সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে, এফএমআর পার্বত্য উপজাতি এবং ভারত বা মায়ানমারের যেকোনও নাগরিক যিনি "সীমান্তের যেকোন দিকের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে বাস করেন, সীমান্ত পেরোনর আইনসম্মত ছাড়পত্র দেখাতে পারলে, তিনি সীমান্তের অন্যপ্রান্তে প্রতিবার দুই সপ্তাহ করে থাকার অনুমতি পাবেন, এবং এই অনুমতি এক বছর বৈধ থাকবে।"

দ্বিতীয়ত, মায়ানমারের কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট করিডর প্রোজেক্ট এবং ইন্ডিয়া-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিপক্ষীয় মহাসড়কের মত পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক প্রকল্পে ভারতের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছিল। মায়ানমারে সুদীর্ঘ ও নিরবিচ্ছিন্ন গৃহযুদ্ধের কারণে এই প্রকল্পগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে আছে। এছাড়াও আছে মায়ানমারে ভারত সরকারের দ্বারা ২০১৬ সালে নির্মিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিতওয়ে নদী বন্দর, যার সাহায্যে ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলি সহজে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে পারে। উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর, এই দেশের উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি, বিশেষ করে যে চারটি রাজ্য ও মায়ানমার একটি সাধারণ সীমান্ত ভাগ করে নেয়, সেগুলি কার্যত স্থলবেষ্টিত হয়ে পড়ে এবং ভারত-নির্মিত সিতওয়ে বন্দর এই রাজ্যগুলির হাতে একটি বিকল্প তুলে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, ভারতের "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি", যার উদ্দেশ্য দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন, তার সাফল্যের ক্ষেত্রে মায়ানমার একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কর্পোরেশন (এসএএআরক)-এ নতুন দিল্লির সাফল্য খুবই সামান্য বলে ভারত তার মনোযোগ সরিয়ে দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার উপর এনেছে। বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিকাল অ্যান্ড ইকোনোমিক কোঅপারেশন (বিআইএমএসটিইসি), যা ভারত, ভুটান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপাল আর শ্রীলঙ্কাকে সংযুক্ত করে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মায়ানমার। সম্প্রতি বাংলাদেশের ভারতপন্থী সরকার গদিচ্যুত হয়েছে এবং তারপর যদি মায়ানমারেও ভারতের প্রভাব কমে যায়, তাহলে নতুন দিল্লির জন্য তার প্রতিবেশী অঞ্চল আরও সমস্যাজনক হয়ে উঠবে।

চতুর্থত, মায়ানমারের অভ্যুত্থানকারী দলগুলি মাদক সরবরাহের সঙ্গেও যুক্ত এবং ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে, যেখানে মাদকের ব্যবহারে হঠাৎ বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, সেখানে এই ঘটনার মারাত্মক পরিণতি দেখা যেতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে, মায়ানমারের সীমান্ত অঞ্চল থেকে প্রচুর সংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতের মণিপুর ও মিজোরাম রাজ্যে প্রবেশ করছে। এই বিশাল জনস্ফীতি যদি অপ্রতিহত অবস্থায় চলতে থাকে, তবে এই অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ার অভূতপূর্ব ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই মণিপুরে মেইতেই (ইম্ফল উপত্যকায় ও আশেপাশে বসবাসকারী জনজাতি) ও কুকি (সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি)-দের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। এই রাজ্যের

যুদ্ধবিদ্ধস্ত সরকার এই হিংসার কিছুটা অংশের দায় উদ্বাস্তুদের উপর চাপাচ্ছেন। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করার পর কেন্দ্রসরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন (সরাসরি কেন্দ্রের শাসন) জারি করা হয়েছে।

চিনের ভূমিকা

এই সমীকরণে চিনের ভূমিকা ঠিক কি, তা খুঁটিয়ে দেখা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। বেইজিং মায়ানমারের শাসকদল ও বিরোধী দল, দুই পক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। চিন যেহেতু ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি কাউন্সিল (ইউএনএসসি)-এর সদস্য এবং ভেটোদানের ক্ষমতা রাখে, সেহেতু ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের জন্য বেইজিঙের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেল এবং গ্যাসের পাইপলাইনের মত দেশের পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে চিনের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগও আছে। এই পাইপলাইন দক্ষিণ চিন থেকে মায়ানমারের কিয়াউকপিউ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে, স্ট্রেটস অফ মালাক্কা, যা বরাবরই চিনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাকে চিন এড়িয়ে যেতে পারে।

এছাড়াও, চিন মায়ানমারের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং এই দেশের জন্য বিনিয়োগের সুবিশাল পরিকল্পনা আছে চিনের। ভারতের মতই, চিনও চায় মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে বিরতি, কারণ এই নিরবিচ্ছন্ন হিংসার কারণেই বেইজিং যে সমস্ত প্রকল্পে অনুদান দিচ্ছিল বা সহায়তা করছিল, সেগুলি সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। সম্প্রতি ক্ষমতাসীন সামরিক নেতা মিন অং হ্লাইং, ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর তাঁর প্রথম চিন ভ্রমণের সময় কুনমিং-এ গ্রেটার মেকং সাবরিজিয়ন এবং আয়েয়াওয়াডি-চাও ফ্রায়া-মেকং ইকোনোমিক কোঅপারেশন স্ট্র্যাটেজি (এসিএমইসিএস) সম্মেলনদুটিতে অংশগ্রহণ করতে যান। আন্তর্জাতিক নানা গোষ্ঠী, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মায়ানমারের সামরিক সরকারের উপর থেকে চিন যাতে তার সমর্থন তুলে নেয়, তার জন্য বেইজিং-এর উপর চাপ দিচ্ছে।

চিন আগেও উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন বিদ্রোহী দলকে সমর্থন করেছে, এবং এবারও ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করতে পারে চিন। ভারতে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে দিয়ে যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে সই করাতে সফল হয়েছে নতুন দিল্লি। চিন যদি এই নিভন্ত আগুনকে আবার জ্বালানর চেষ্টা করে, তাহলে ভারত আরও বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।

গতিপথ ও সমন্বয়

ভারতের হাতে যে অনেক বিকল্প আছে এমন নয়। মায়ানমারের ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের যোগাযোগ আছে, কিন্তু, যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকম গণ-বিবৃতি দেওয়া হয় নি, তাই ওই দেশের অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহী দলগুলির সঙ্গে ভারত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। সাম্প্রতিক কালে, ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ বড় কিছু বিনিয়োগ এসেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জিআইসিএ)-এর অনুদানের সাহায্যে ভারতের দীর্ঘতম সেতুটি এই অঞ্চলে নির্মিত হতে চলেছে। নতুন দিল্লিকে মনে রাখতে হবে যে, মায়ানমারে ঘটে চলা হিংসার ঘটনার ছায়া যদি আবার ভারতের উপর এসে পড়ে, তাহলে এই দেশের উত্তরপূর্ব অংশটি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে, এবং এই অঞ্চলের উন্নয়ন বেশ কয়েক বছরের মত পিছিয়ে যাবে। ভারতের দিক থেকে মায়ানমারের বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা অবশ্যই ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারকে উৎফুল্ল করবে না, কিন্তু, বিশেষ করে মিজোরাম ও মণিপুরের মত ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে, নতুন দিল্লির প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা।

অতীতেও, মায়ানমারের ভূমিজ গণতান্ত্রিক নেতা অং সান সু কি-র ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি)-র পাশাপাশি মায়ানমারের সামরিক সরকারের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম ছিল ভারত।

মায়ানমার এএসইএএন-এর সদস্য এবং এই দেশের সামরিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য, এএসইএএন-এর সঙ্গে কার্যকরভাবে সমন্বয় সাধন ভারতের জন্য জরুরি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারবে, চিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এ নতুন দিল্লি যোগ দেয় নি এবং, সেই জন্য ইন্ডিয়া-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিপক্ষীয় মহাসড়ক-এর মত সংযোগকেন্দ্রিক প্রকল্প ভারতের "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি"-র জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মিজোরাম ও মণিপুরের মত ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্যেগুলিতে মায়ানমারের থেকে অনেক মানুষ ঢুকে পড়েছেন, এবং এই জন্য নতুন দিল্লির নিজের স্বার্থেই দেখা দরকার যাতে মায়ানমারে, অন্তত ভারত-মায়ানমারের সীমান্ত অঞ্চলে, লড়াই বন্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে নতুন দিল্লি তার মিত্রদেশ রাশিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারে, কারণ রাশিয়া শুধু মায়ানমারের সামরিক শাসকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি নি, তার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশ মায়ানমারের সরকারের অন্যতম প্রধান অস্ত্র-সরবরাহকারী।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে, বিআইএমএসটিইসি-র সদস্য দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সম্মেলন চলাকালীন, ভারতের ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাডভাইসার অজিত দোভাল মায়ানমারের ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাডভাইসার, অ্যাডমিরাল মো অং-এর সঙ্গে নেপিডোতে সাক্ষাৎ করেন, এবং সেখানে মায়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে নতুন দিল্লির দুশ্চিন্তার কথা আলোচিত হয়েছে বলে জানা যায়।

আগে কখনই মায়ানমারের সামরিক শাসকদলের সঙ্গে যোগাযোগের পথ তৈরির ক্ষেত্রে নতুন দিল্লি ও অং সান সু কি-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় নি। মূল বিষয়টি হল, মায়ানমারের পরিস্থিতির জন্য নতুন দিল্লিকে উদ্ভাবনী কূটনীতি ও অ-প্রথাসিদ্ধ সমাধানের পন্থা খুঁজতে হবে। মায়ানমারের অনেক অংশেই ওই দেশের সামরিক সরকার তার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে, তাই নানা সরকার-বিরোধী দলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা তৈরি করতে পারলে নতুন দিল্লিরই ভাল হবে।

রূপকজ্যোতি বোরা জাপান ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।